নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে কিছু প্রশ্ন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৪ মে, ২০১৩)

বাংলাদেশ সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশনকে সংসদীয় নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেন্দয়া হয়েছে। *সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশ*, ১৯৭৬ড়-এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী, প্রত্যেক আদমশুমারির পর নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা বাধ্যতামূলক। আইনের ৬(২) ধারা অনুসারে, সীমানা পুনঃনির্ধারণের ভিত্তি হলো:

"6. Delimitation of Constituencies, etc. - (1) The Commission shall, for the of purpose of elections to the seats in Parliament, divide the country into as many single territorial constituencies as the number of member to be elected under clause (2) of article 65 of the Constitution.

"(2) The constituencies shall be so delimited, having regard to administrative convenience, that each constituency is a compact area and in doing so due regards shall be had, as far as practicable, to the distribution of population as given in the latest census report."

অর্থাৎ অধ্যাদেশের ৬ ধারা অনুযায়ী, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ নির্ধারিত একক নির্বাচনী এলাকার সংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশকে বিভক্ত করতে হবে। এই বিভক্তির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সুবিধা (administrative convenience), আঞ্চলিক অখ ন্ডতা (compact area) এবং সর্বশেষ আদমশুমারী থেকে প্রাপ্ত জনসংখ্যার বিভাজনকে (distribution of population) যতদূর সম্ভব বিবেচনায় নিতে হবে।

আইনের এ বিধান অনুসরণে কমিশন গত ৬ ফেব্র ন্ডয়ারি ২০১৩ একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছে। খসড়া তালিকা অনুযায়ী, কমিশন ৮৮টি আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করেছে। তালিকাটি প্রকাশের পর ৮১৩টি আপত্তি নির্বাচন কমিশনে জমা পড়েছে (*যায় যায় দিন*, ২৮ মার্চ ২০১৩)। ঢাকার বিভিন্ন আসন সম্পর্কে কমিশনে আপত্তি এসেছে ১৮৯টি। এর মধ্যে ঢাকা-১, ২ ও ৩ নিয়ে আবেদন এসেছে ৫৬টি। ঢাকা-৪, ৬ ও ৮ নিয়ে আবেদন এসেছে ২১টি। শুধু ঢাকা-১৫ আসন সম্পর্কে আবেদন এসেছে ৬৪টি।

আপত্তি উত্থাপনকারীদের পক্ষ থেকে সর্বমোট ৮৮টি পরিবর্তিত সংসদীয় আসনের ৫৫টির বিদ্যমান সীমানা বহাল রাখার দাবি এসেছে। বাকি ৩৩টি আসনের ৩১টির বিভিন্ন এলাকা সংযোজন ও বিয়োজনের প্র স্ড়াব করা হয়েছে। অন্য দুটিতে ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সীমানায় ফিরে যাবার দাবি এসেছে। যে ৫৫টি আসনের ২০০৮ সালের বা বিদ্যমান সীমানা বহাল রাখার দাবি এসেছে, সেগুলো হলো: কুড়িগ্রাম-৩ ও ৪, বগুড়া-৫, সিরাজগঞ্জ-২, পাবনা-১ ও ২, চুয়াডাঙ্গা-১ ও ২, যশোর-৫ ও ৬, খুলনা-৩ ও ৬, সাতক্ষীরা-৩ ও ৪, পটুয়াখালী-২, পিরোজপুর-১, ২ ও ৩, টাঙ্গাইল-৫ ও ৬, মানিকগঞ্জ-২ ও ৩, ঢাকা-১, ৩, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৮, গাজীপুর-৫, নরসিংদী-২, নারায়ণগঞ্জ-৫, ফরিদপুর-২, শরীয়তপুর-২ ও ৩, সুনামগঞ্জ-৫, সিলেট-২ ও ৩, মৌলভীবাজার-২ ও ৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ ও ৫, কুমিল-া-৭, ৮ ও ১০, লক্ষীপুর-২, ৩ ও ৫ এবং চট্টগ্রাম-১৪ আসন। ২০০১ সালের সীমানায় ফিরে যাওয়ার দাবী এসেছে বরিশাল-৩ ও সিলেট-৪ থেকে (*যায় যায় দিন*, ২৮ মার্চ ২০১৩)।

বর্তমানে খসড়া তালিকার ব্যাপারে আপত্তিগুলোর শুনানি শুর হয়েছে ২৩ এপ্রিল এবং শুনানি শেষ হবে ১২ মে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ একটি অতি গুর ত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কারণ যথাযথভাবে সীমানা পুনঃনির্ধারণের ওপর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভর করে।

কমিশনের প্রকাশিত সীমানা পুনঃনির্ধারণের খসড়া তালিকাটি নিয়ে কয়েকটি গুর ত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা জর রি: খসড়া তালিকাটি কি বিদ্যমান আইন অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে? এতে কি আইনের ৬ ধারায় বর্ণিত মানদ ের প্রতিফলন ঘটেছে? এটি কি আন্ড র্জাতিক মানদ ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? এক্ষেত্রে কমিশন 'জেরিমেন্ডারিং' বা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করেছে কিনা? এসব প্রশ্নের সন্ড োষজনক উত্তরের ওপর নির্ভর করবে পুনঃনির্ধারিত সীমানার গ্রহণযোগ্যতা এবং কমিশনের নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা।

কমিশন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'সীমানা পুনঃনির্ধারণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: (১) প্রতিটি জেলার ২০০৮ সালে নির্ধারিত মোট আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা; (২) নির্বাচনী এলাকাসমূহের পূর্বে নির্ধারিত সীমানা যতদূর সম্ভব বহাল রাখা; (৩) সংসদীয় আসন জেলা ভিত্তিক বন্টন এবং এক এক জেলায় অবস্থিত সংসদীয় আসনের এলাকা অন্য জেলায় সম্প্রসারণ না করা; (৪) যেখানে সম্ভব উপজেলা অবিভাজিত রাখা; (৫) যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন/সিটি/পৌর ওয়ার্ড একাধিক সংসদীয় আসনের মধ্যে বিভাজন না করা; এবং (৬) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা জনগণের যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনায় রাখা।'

দুর্ভাগ্যবশত উপরিউক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত পদ্ধতি আইনে নির্ধারিত মানদ ের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বস্তুত, বর্তমান কমিশনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপ আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গেই সাংঘর্ষিক। কারণ সীমানা পুনঃনির্ধারণের পর আসনগুলোর মধ্যে ভোটার সংখ্যার পার্থক্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে আরও বেড়েছে।

নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, 'নির্বাচনী এলাকাসমূহের পূর্বে নির্ধারিত সীমানা যতদূর সম্ভব বহাল রাখা' হয়েছে। অর্থাৎ সর্বশেষ ২০০৮ সালে নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকার সীমানা পারতপক্ষে পরিবর্তন করা হয়নি, যদিও কয়েকটি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষপাতিত্বের

অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু সীমানা পুনঃনির্ধারণের উদ্দেশ্যই হল জনসংখ্যার তথ্য বিবেচনায় নেওয়া, যাতে করে জনসংখ্যার দিক থেকে নির্বাচনী এলাকাসমূহে যতদূর সম্ভব সমতা সৃষ্টি হয়। এ কারণেই প্রতিটি আদমশুমারীর পর নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই কমিশনের পূর্বে নির্ধারিত সীমানা যতদূর সম্ভব বহাল রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত, এই নীতি অনুসরণের ফলে কমিশনের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক পদক্ষেপ, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, লোক দেখানো উদ্যোগ বলেই মনে হতে পারে। ফলে কমিশনের বিরুদ্ধে, এমনকি তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অভিযোগও উত্থাপন করা যেতে পারে।

একথা সত্য যে, সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশনের দায়িত্ব হল তিনটি মানদণ্ডের - প্রশাসনিক সুবিধা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং ভোটার সংখ্যার - মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। আর এ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। অর্থাৎ তিনটির মধ্যে জনসংখ্যার বিভাজনই 'সুপেরিয়ার' বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দুটি মানদণ্ডে সাধারণত তেমন পরিবর্তন ঘটে না। এছাড়াও প্রশাসনিক সুবিধা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যায় বিরাট পার্থক্য বিরাজ করলে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যই ভুল হতে পারে। কারণ এর সঙ্গে সমতার প্রশ্ন জড়িত। উপরন্তু ভোটার সংখ্যায় বিরাট পার্থক্য বিরাজ করলে সব নির্বাচনী এলাকার জন্য একই অংকের নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারণ করে দেওয়া চরমভাবে বৈষম্যমূলক। উপরন্তু যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন বরাদ্দ আসন ভিত্তিক দেওয়া হয়, তাই নির্বাচনী এলাকার আসনগুলোর ভোটার সংখ্যায় বিরাট পার্থক্য থাকলে, ভোটার সংখ্যার দিক থেকে বড় আসনগুলোর জনগণ বঞ্চিত হয়।

সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত সরকারি কর্মকর্তারা সহায়তা করে থাকেন। কর্মকর্তারা মূলত প্রশাসনিক সুবিধা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার ওপর জোর দিয়ে থাকেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষত যেখানে সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য স্বাধীন কর্তৃপক্ষ থাকে, প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার জন্য ভোটার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০২ সালের সীমানা নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ভারতের **স্বাধীন সীমানা নির্ধারণ কমিশন** উত্তর প্রদেশের রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আসনের ভোটার সংখ্যা, ১০ শতাংশ বাড়ানো-কমানোর সুযোগ রেখে, তিন লাখ ২৭ হাজার ৬৯৬ জনে নির্ধারণ করে দেয় (*ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল উইকলি*, ৪ মার্চ ২০০৬)।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, বর্তমান কমিশনের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে সীমানা পুনঃনির্ধারণ না করার কারণে অতীতের ন্যায় নির্বাচনী এলাকাসমূহের মধ্যে ভোটার সংখ্যার বিরাট পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যেমন, গত নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৮ সালের সীমানা পুনঃনির্ধারণের পর সবচেয়ে বড় নির্বাচনী এলাকার (ঢাকা-১৯) ভোটার সংখ্যা ছিল ছয় লাখ ২ হাজার ৩৮৬ জন; একই সময়ে সব চেয়ে ছোট নির্বাচনী এলাকার (ঝালকাঠি-১ আসনে) ভোটার সংখ্যা ছিল এক লাখ ৩৭ হাজার ৯১ জন। অর্থাৎ এই দুই নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যার পার্থক্য ছিল সাড়ে চার লাখের বেশি। সম্প্রতি প্রকাশিত খসড়া তালিকার তথ্যানুযায়ী, ঢাকা-১৯-এ এবারও সর্বাধিক সংখ্যক - আট লাখ ২ হাজার ১৬৪ জন - ভোটার রয়েছে। পক্ষান্তরে যশোর-৪-এর ভোটার সংখ্যা সর্বনিম্ন এক লাখ ৪৪ হাজার ৪৬ জন। ফলে সীমানা পুনঃনির্ধারণের পর ভোটার সংখ্যার দিক থেকে সব চেয়ে বড় নির্বাচনী এলাকার সঙ্গে সব চেয়ে ছোট নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যার ব্যবধান সাড়ে ছয় লাখের অধিকে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ অসমতা আরও বেড়েছে, যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না।

অসমতা বৃদ্ধির চিত্রটি আরও সুস্পষ্ট হয় ২০০৮ সালের নির্বাচন-পূর্ব সীমানা নির্ধারণের ফলাফলের সঙ্গে সাম্প্রতিক পুনঃনির্ধারণের ফলাফলের তুলনা করলে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল আট কোটি ১০ লাখ ৫৮ হাজার ৬৯৮ জন (*প্রথম আলো*, ৩ জানুয়ারি, ২০১৩), ফলে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দুই লাখ ৭০ হাজার ২৯০ জন। তুলনামূলক চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ওই নির্বাচনে ১১১টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ৩৯টি আসনে +১১-২০ শতাংশের মধ্যে, ৬৭টি আসনে -১১-২০ শতাংশের মধ্যে, ১৯টি আসনে +২১-৩০ শতাংশের মধ্যে, ২৬টি আসনে -২১-৩০ শতাংশের মধ্যে, ২২টি আসনে +৩১ শতাংশের বেশি এবং ১৬টি আসনে -৩১ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ গত নির্বাচনে ১১১টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ১০৬টি (৩৯ + ৬৭) আসনে +১১-২০ শতাংশের মধ্যে এবং বাকী ৮৩টি (১৯+২৬+২২+১৬) আসনে ±২১ শতাংশের উর্ধ্বে।

স্নস্ত্রস্ত্রস্ম শ্চপ্প্ল সবচেয়ে বেশি (৩১ শতাংশের বেশি) অসমতা ছিল: দিনাজপুর-৬ (+৩৮ শতাংশ), কুড়িগ্রাম-১ (+৩৫ শতাংশ), বগুড়া-৫ (+৩৩ শতাংশ), বগুড়া-৭ (+৩৭ শতাংশ), মেহেরপুরে-২ (-৩২ শতাংশ), চুয়াডাঙ্গা-১ (+৩১ শতাংশ), নড়াইল-১ (-৩২ শতাংশ), বাগেরহাট-৩ (-৩১ শতাংশ), খুলনা-৩ (-৩২শতাংশ), পটুয়াখালী-৪ (-৩১ শতাংশ), বরিশাল-৩ (-৩২ শতাংশ), বরিশাল-৬ (-৩২ শতাংশ), ঝালকাঠি-১ (-৪৯ শতাংশ), পিরোজপুর-৩ (-৪১ শতাংশ), নেত্রকোনা-৫ (-৩২ শতাংশ), ঢাকা-২ (+৪০ শতাংশ), ঢাকা-৫ (+৩৪ শতাংশ), ঢাকা-৯ (+৩২ শতাংশ), ঢাকা-১৮ (+৬৪ শতাংশ), ঢাকা-১৯ (+১২৩ শতাংশ), গাজীপুর-১ (+৯৮ শতাংশ), গাজীপুর-২ (+৯৫ শতাংশ), গাজীপুর-৩ (+৫০ শতাংশ), নারায়ণগঞ্জ-৩ (+৩৫ শতাংশ), নারায়ণগঞ্জ-৪ (+৩৫ শতাংশ), নারায়ণগঞ্জ-৫ (+৩৪ শতাংশ), রাজবাড়ী-২ (+৩২ শতাংশ), মাদারীপুর-১ (-৩৩ শতাংশ), শরিয়তপুর-৩ (-৩৩ শতাংশ), সিলেট-১ (+৫৭ শতাংশ), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬ (-৩৪ শতাংশ), নোয়াখালী-৬ (-৩৩ শতাংশ), লক্ষীপুর-১ (-৪০ শতাংশ), চট্রগ্রাম-৭ (+৩৯ শতাংশ), চট্রগ্রাম-৯ (+৪২ শতাংশ), চট্রগ্রাম-১০ (+৬১ শতাংশ), এবং চট্রগ্রাম-১৬ (-৪৩ শতাংশ) আসনে। অর্থাৎ ২০০৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে পূনঃনির্ধারিত আসনগুলোর মধ্যে ৩৭টি আসনের ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা থেকে ±৩১ শতাংশের উর্ধ্বে।

পক্ষান্তরে, ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, আমাদের মোট ভোটার সংখ্যা নয় কোটি ২১ লাখ ২৯ হাজার ৮৫২ জন, ফলে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা প্রায় তিন লাখ সাত হাজার ১০০ জন। তুলনা করলে দেখা যায় যে, এই নির্বাচনে ১০৬টি আসনে ভোটার সংখ্যা ছিল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ৪১টি আসনে +১১-২০ শতাংশের মধ্যে, ৫১টি আসনে -১১-২০ শতাংশের মধ্যে, স্থ৬টি আসনে +২১-স্পস্ত্র শতাংশের মধ্যে, ২৬টি আসনে -২১-৩০ শতাংশের মধ্যে, ৩১টি আসনে +৩১ শতাংশের উর্ধ্বে এবং ২৯টি আসনে -৩১ শতাংশের উর্ধ্বে। অর্থাৎ আসন্ন নির্বাচনে ১০৬টি আসনের ভোটার সংখ্যা হবে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যার ±১০ শতাংশের মধ্যে, ৯২টি (৪১+৫১) আসনের ±২০ শতাংশের মধ্যে এবং বাকি ১০২টি (১৬+২৬+৩১+২৯) আসনের ±২১ শতাংশের উর্ধ্বে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে ২০০৮ সালে আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা থেকে ±২১ শতাংশের উর্ধ্বের ভোটার সম্বলিত আসন সংখ্যা ছিল ৮৩, সেখানে ২০১৩ সালের ভোটার তালিকা অনুযায়ী তা এসে দাঁড়িয়েছে ১০২-এ। অর্থাৎ ২০১৩ সালের সীমানা পুনঃনির্ধারণের ফলে সংসদীয় আসনগুলোর মধ্যে ভোটার সংখ্যার দিক থেকে ২০০৮ সালের তূলনায় আরও অসমতা বেড়েছে।

শ্চপ্ল ক্ষগম্ন শ্চক্স্নদ্রগ্নস্তদ্বট্টস্ক্লদ্রষ্প্স্কল্ল ল্দস্প্ল সবচেয়ে বেশি (৩১ শতাংশের বেশি) অসমতা ব্রুট্স্প্ল ক্সট্স্কস্ট: দিনাজপুর-৬ (+৩৬ শতাংশ), রংপুর-১ (-৩৪ শতাংশ), রংপুর-৩ (+৫২ শতাংশ), কুড়িগ্রাম-১ (+৩৪ শতাংশ), কুড়িগ্রাম-২ (+৪৩ শতাংশ), কুড়িগ্রাম-৪ (-৩৩ শতাংশ), বগুড়া-৫ (+৩৯ শতাংশ), বগুড়া-৭ (+৩৮ শতাংশ), ব্রুহেরপুরে-২ (-৩৩ শতাংশ), চুয়াডাঙ্গা-১ (+৪৮ শতাংশ), যশোর-৩ (+৬২ শতাংশ), যশোর-৪ (-৫৩ শতাংশ), যশোর-৫ (+৪৯ শতাংশ), যশোর-৬ (-৪৩ শতাংশ), নড়াইল-১ (-৩৩ শতাংশ), বাগেরহাট-৩ (-৩২ শতাংশ), খুলনা-৩ (-৩২ শতাংশ), সাতক্ষীরা-৪ (+৩৫ শতাংশ), বরিশাল-৬ (-৩১ শতাংশ), ঝালকাঠি-১ (-৫০ শতাংশ), পিরোজপুর-২ (-৩৯ শতাংশ), পিরোজপুর-৩ (-৪৫ শতাংশ), টাংগাইল-৫ (+৫৮ শতাংশ), টাংগাইল-৬ (-৩৩ শতাংশ), জামালপুর-২ (-৩৬ শতাংশ), জামালপুর-৫ (+৩৭ শতাংশ), ময়মনসিংহ-৩ (-৩৩ শতাংশ), ময়মনসিংহ-৪ (+৬৪ শতাংশ), নেত্রকোনা-৫ (-৩৭ শতাংশ), ঢাকা-১ (-৫০ শতাংশ), ঢাকা-৩ (+৫৩ শতাংশ), ঢাকা-৪ (-৩৭ শতাংশ), ঢাকা-১২ (+৭৫ শতাংশ), ঢাকা-১৩ (+৫০ শতাংশ), ঢাকা-১৪ (+৪৪ শতাংশ), ঢাকা-১৮ (+৩২ শতাংশ), ঢাকা-১৯ (+১৬১ শতাংশ), গাজীপুর-১ (+১০২ শতাংশ), গাজীপুর-২ (+১০০ শতাংশ). গাজীপূর-৩ (+৫০ শতাংশ), নরসিংদী-২ (-৩৩ শতাংশ), নরসিংদী-৩ (-৩৭ শতাংশ), নারায়ণগঞ্জ-৩ (+৫২ শতাংশ). নারায়ণগঞ্জ-৪ (+৪৭ শতাংশ), রাজবাড়ী-২ (+৩১ শতাংশ), গোপালগঞ্জ-৩ (-৩১ শতাংশ), শরীয়তপুর-৩ (-৩১ শতাংশ), সিলেট-১ (+৬১ শতাংশ), সিলেট-৩ (-৩১ শতাংশ), মৌলভীবাজার-২ (-৩১ শতাংশ), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১ (-৩৭ শতাংশ), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩ (+৪৫ শতাংশ), ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬ (-৩৬ শতাংশ), কুমিল-া-৮ (+৪৭ শতাংশ), নোয়াখালী-৪ (+৪০ শতাংশ), লক্ষীপুর-১ (-৩৯ শতাংশ), চট্রগ্রাম- ৩ (-৪২ শতাংশ), চট্রগ্রাম-৮ (+৪৩ শতাংশ), চট্রগ্রাম-১০ (+৪৪ শতাংশ), চট্রগ্রাম-১১ (+৬৩ শতাংশ), এবং চট্রগ্রাম-১৪ (-৩৫ শতাংশ) আসনে। অর্থাৎ বর্তমান নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সীমানা পুনঃনির্ধারিত আসনগুলোর মধ্যো ৬১টি আসনের ভোটার সংখ্যা হল আসন প্রতি গড় ভোটার সংখ্যা থেকে ±৩১ শতাংশের উর্ধ্বে। তাই সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে ২০০৮-এর তূলনায় ২০১৩-এ অসমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, নতুন করে সীমানা

পুনঃনির্ধারণের ফলে ভোটার সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে ছোট আসন যশোর-৪ এর তুলনায় সবচেয়ে বড় আসন ঢাকা-১৯ এর পার্থক্য হল ১০৮ শতাংশ।

সাম্প্রতিক সীমানা পুনঃনির্ধারণের পর এমনকি বিভিন্ন জেলার নির্বাচনী এলাকার মধ্যেও ভোটার সংখ্যার বিরাট তারতম্য রয়ে গিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, খসড়া তালিকায় ঢাকা-১৯-এর আট লক্ষাধিকের তুলনায় ঢাকা-১-এর ভোটার সংখ্যা মাত্র এক লাখ ৫২ হাজার ৫১৭ জন। একইভাবে গাজীপুর-১-এর ভোটার সংখ্যা ছয় লাখ ২১ হাজার ৭৮৬ জন হলেও গাজীপুর-৪-এর ভোটার সংখ্যা দুই লাখ ২৯ হাজার ৮৮৩ জন। এইসব বিরাট পার্থক্য আইনে বর্ণিত ভোটার সংখ্যার সমতা রক্ষার মানদণ্ডের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ।

নির্বাচন কমিশন অবশ্য দাবি করতে পারে যে, তারা নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যায় 'যতদূর সম্ভব' সমতা রক্ষার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশে 'যতদূর সম্ভবে'র কোনো সংজ্ঞা দেওয়া নেই। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যার মধ্যে 'ভেরিয়েশন' বা পার্থক্য সাধারণত ২০ শতাংশের মধ্যে। যেমন - যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, আলবেনিয়া, ইয়েমেনে গ্রহণযোগ্য পার্থক্য ৫ শতাংশ; অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, ইউক্রেনে ১০ শতাংশ; আরমেনিয়া, জার্মানি, চেক রিপাবলিকে ১৫ শতাংশ; জিম্বাবুয়ে, পাপুয়া নিউগিনিতে ২০ শতাংশ, কানাডাতে ২৫ শতাংশ; সিঙ্গাপুরে ৩০ শতাংশ (লিসা হেনডলি, ২০০৭)।

কমিশনের সাম্প্রতিক নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ উদ্যোগ আরেকভাবেও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। সংসদীয় এলাকা পুনঃনির্ধারণের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হল: নিরপেক্ষতা (Impartiality), প্রতিনিধিত্ব (Representativeness), ভোটার সংখ্যার সমতা (Equality of voting strength), বৈষম্যহীনতা (Non-discrmination) এবং স্বচ্ছতা (Transparency)। তাই কমিশন ঘোষিত খসড়া তালিকায় এক নির্বাচনী এলাকা থেকে আরেক নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যায় বিরাট পার্থক্য সমপ্রতিনিধিত্ব ও ভোটার সংখ্যার সমতার মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

নির্বাচন কমিশন কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে খসড়া সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজটি সম্পন্ন করেছে? অনেকেরই স্মরণ আছে যে, গত ডিসেম্বর মাসে কমিশন যখন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এ বিষয়ে সংলাপ করে, তখন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে নির্ধারিত সীমানার ভিত্তিতে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জোর দাবি উত্থাপন করে (*দি ডেইলি স্টার*, ৬ ডিসেম্বর ২০১২)। পক্ষান্তরে, বিকল্প ধারার মত দল পূর্বের নির্ধারিত সীমানা সম্পূর্ণ বাতিল করার দাবি তোলে। কিন্তু কমিশন, নিজ স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই, গতবারের নির্ধারিত সীমানা যতদূর সম্ভব বহাল রেখেছে। আমরা জানি না কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষমতাসীনদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে কি-না, তবে এ ব্যাপারে সন্দেহ করার যথেষ্ঠ যৌক্তিকতা রয়েছে। এটি সুস্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারি করা বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখা যায় যে, ২০০৮ সালের নির্ধারিত সীমানার যে ৮স্মটিতে পরিবর্তন এনেছে, তা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকার ভোটার সংখ্যায় সমতা আনার জন্য করা হয়নি। তবে কি শুধুমাত্র প্রশাসনিক সুবিধা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য তা করা হয়েছে? না-কি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেছে? সরকারি দলের একাধিক সংসদ সদস্যই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ তুলেছেন।

অভিযোগ ওঠেছে যে, মাননীয় আইন প্রতিমন্ত্রী জনাব কামরুল ইসলামের মৌখিক অনুরোধে তাঁর নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-২ আসনের সীমানা পুনঃবিন্যাস করা হয় (*প্রথম আলো*, ৩১ মার্চ ২০১৩)। এ পুনঃবিন্যাস করতে গিয়ে ঢাকার অন্য ১৫টি আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করতে হয়েছে এবং ঢাকার আট জন সংসদ সদস্য এর বিরুদ্ধে কমিশনে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত সীমানা পুনঃবিন্যাস সম্পর্কে ঢাকা-৭ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য জনাব মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন অভিযোগ করেন যে, 'নির্বাচন কমিশন আমাদের সরকারের প্রভাবশালী একজন প্রতিমন্ত্রীর স্বার্থরক্ষা করে ঢাকার আসনের সীমানা বিন্যাসের প্রস্তাব করেছে। একজনের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে ১৫ জনের স্বার্থহানী করাটা অন্যায়' (*প্রথম আলো*, ৩১ মার্চ ২০১৩)। নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ অবশ্য কোনো বিশেষ ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা করে সীমানা পুনঃনির্ধারণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সরকার দলীয় আরেকজন মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব জাকির হোসেন একজন নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বার্থে এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কুড়িগ্রাম জেলার নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজে পক্ষপাতদুষ্ট হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কমিশনে শুনানিকালে তিনি দাবি করেছেন, 'কমিশন সচিবালয়ের নীচতলায় বসে কুড়িগ্রামের আসন তছনছ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। একজন নির্বাচন কমিশনারের ছেলে ও জামাতা কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচন করতে চাইছেন। তাঁদের জন্য পছন্দসই সীমানা সাজাতে কুড়িগ্রামের আসনগুলোকে হাত দিয়েছেন এই নির্বাচন কমিশনার।' প্রায় একই অভিযোগ করেন ওই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জাপা নেতা গোলাম হাবিব ও চিত্রপরিচালক বাদল খন্দকার (*কালের কণ্ঠ*, ২৪ এপ্রিল ২০১৩)। এ সময় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোবারক ও জনাব মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ সংসদ সদস্যের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। আশা করি গণমাধ্যমের বন্ধুরা এ অভিযোগ দুটি খতিয়ে দেখবেন।

তবে আমাদের বিশে- ষণ থেকে দেখা যায় যে, কুড়িগ্রামের আসনগুলোর সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি নাড়াচাড়া করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম-২ আসনের ভোটার সংখ্যা ২০০৮ সালে সারাদেশের গড় ভোটার সংখ্যার ২৩ শতাংশ বেশি হলেও, সাম্প্রতিক সীমানা পুনঃনির্ধারণে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে কুড়িগ্রাম-৪ আসনের ভোটার সংখ্যা ২০০৮ সালে সারাদেশের গড় ভোটার সংখ্যার ১৫ শতাংশ কম হলেও, সাম্প্রতিক সীমানা পুনঃনির্ধারণে তা আরও কমে ৩৩ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, কুড়িগ্রামের চারটি আসনের মধ্যে দুটিতেই ভোটার সংখ্যার অসমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন যুক্তিতে তা করা হয়েছে তা কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

এছাড়াও আমাদের প্রাথমিক বিশে-ষণ থেকে দেখা যায়, সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিবর্তন এসেছে রংপুর, কুড়িগ্রাম, যশোর, টাংগাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চট্টগ্রাম জেলায়। এগুলোও খতিয়ে দেখার জন্য আমরা সাংবাদিক বন্ধুদের আহবান জানাই।

এটি সুস্পষ্ট যে, বর্তমান নির্বাচন কমিশন যেন বিতর্ক এড়াতে পারছে না। বিতর্ক রয়েছে কমিশনের সদস্যগণের নিয়োগ এবং তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে। তাঁদের কিছু বক্তব্য ও আচরণ নিয়েও প্রশ্ন ওঠেছে। এখন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে কমিশনের নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের যথার্থতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে। আমরা জানি না এ বিতর্কের শেষ কোথায়!

পরিশেষে, নির্বাচন কমিশন অগাধ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। উদাহরণস্বরূপ, সীমানা নির্ধারণ আইনে কমিশনকে নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী, কমিশনের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ড় কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ড় আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। এছাড়াও কমিশনের সিদ্ধান্ড় চ্যালেঞ্জ করার জন্য অন্য কোনো আপিল অথরিটিও নেই। তাই কোনোরূপ স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট কাজ করলে কমিশনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কোনো পদ্ধতি নেই। কোনো বিধান নেই কমিশনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার। তাই *সংসদীয় এলাকার সীমানা নির্ধারণ অধ্যাদেশটি* এবং সংবিধানের **১১৯** অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সীমানা নির্ধারণের জন্য ভারতের ন্যায় একটি স্বাধীন **সীমানা নির্ধারণ কমিশন** গঠনের আমরা প্রস্ড়াব করছি। একই সঙ্গে সংসদীয় এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যার অধিকতর সমতা অর্জনের বিষয়টির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের জন্যা অধ্যাদেশটি সংশোধনের আমরা প্রস্ড়াব করছি।